প্রথম

শুভাশিস সামন্ত

আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি আশেপাশের মানুষগুলো বেশিরভাগই হিন্দিভাষী। বাঙালিও ছিল তবে সংখ্যায় অনেক কম। যেখানে আমার মনের উন্মেষ সেই জায়গাটার নাম গোমো। তখন ছিল বিহার। এখন তা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। এখন তো সে জায়গার নামও পাল্টেছে। এখন নামতে হয় নেতাজি সুভাষ স্টেশনে। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত পাঁচ বোন–উরমিল্লা, প্রিস্কিল্লা, খ্রিপ্রিল্লা, ফুলমিনা আর মার্গারেট। মার্গারেট ছিল আমার খেলার সঙ্গী।

সন্ধেবেলা হ্যারিকেনের আলোতে মা পড়ে শোনাত–

'ওরে, ও গফরা, বলি ঘরে আছিস?

তাহার বছর দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন ডাকছ বাবাকে? বাবার যে জ্বর।

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙ্গা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ– তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন সেদিকে দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কী শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।'

মা পড়ত আর আমি আড়ালে কাঁদতাম। মাকেও দেখেছি চোখ মুছতে। আর যার শোনার কথা সে চলে যায় গভীর ঘুমের রাজ্যে।

আমার তখন ক্লাস থ্রি। মাঝে মাঝে আচমকা স্কুল ছুটি হয়ে গেলে খুব মজা লাগত। সামনেই সরস্বতী পুজো। সেই উপলক্ষে স্কুলে নাটক হবে– দুই বিঘা জমি। আমার চরিত্র বাগানের পাহারাদার। সাংঘাতিক হাঁকডাক করতাম। এখন মনে পড়লে হাসি পায়। আমি তো তখন ছিলাম তালপাতার সিপাই। এইখানে বলে রাখি মা গিয়েছিলেন সেই নাটকটা দেখতে। আর মজার কথা হল, আমাকে সেদিন পড়তে বসতে হয়নি।

তা সে যাই হোক, এই রকম সময়ে একদিন, কী বার ছিল মনে নেই, তবে স্কুল ছুটি ছিল না। বাবা রেলে কর্মরত থাকার জন্য আমার ছোটবেলার পড়াশোনা সবকিছুই রেলের স্কুলে। সকাল ৮–৪৫ থেকেই শুরু হয়ে যেত স্কুলে যাওয়ার তোড়জোর। কারণ স্কুলটা ছিল আমরা যে রেলের বাড়িতে থাকতাম সেখান থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে। সালটা ১৯৭৫। যথারীতি পিঠে স্কুল ব্যাগ নিয়ে পেরিয়ে চলেছি উঁচু নীচু রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে ওভার ব্রিজ। নীচে নেমে ডান হাতে ঘুরে বাঁ হাতে একটা সব্জি বাজার। আর একটু এগিয়ে আমার স্কুল। স্কুলে ঢুকতেই দেখি গৌতম স্যার হাতে একটা কঞ্চি নিয়ে সারা মাঠ ছুটে বেড়াচ্ছেন। আর ছেলেরা সব পাঁচিলের উপর উঠে বাইরে কী একটা দেখার চেষ্টা করছে। স্যারের তাড়া খেয়ে কেউ এবার হয়তো নামছে পাঁচিল থেকে, পরক্ষণেই আবার যে কে সেই এক অবস্থান। আমাদের স্কুলের পাশেই রেলের বড় হাসপাতাল। প্রথমে ভাবলাম, কী হল, এত ভিড় কেন? কী হয়েছে, সাইরেন তো বাজেনি। তা হলে! প্রসঙ্গত বলে রাখি, সাইরেন মাঝে মাঝেই বাজত। আমরা জানতাম পাঁচবার বাজলেই বুঝতে হবে কোনও ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছে। আর সাতবার বাজলে বুঝতে হবে ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে। যাইহোক, স্কুল ব্যাগ রেখে আমিও উঁকিঝুকি দিলাম। না, পাঁচিলে উঠে হবে না। হাসপাতালের জানলা দরজা সব বন্ধ। কী হল রে বাবা! বড়সড় দুর্ঘটনা! সবার চোখ এড়িয়ে হাসপাতালের ভিতর ঢুকে পড়লাম। ও বাবা– কী সব বড়বড় চৌকো আয়নার মতো চারদিকে। অনেক লোক রয়েছে সেখানে। কিন্তু কাউকে কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বড় বড় লাইট রয়েছে।

কী হচ্ছে এখানে কাকু? একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। বলল, শ্যুটিং হচ্ছে। শ্যুটিং কী, আগে কখনও দেখিনি। এই প্রথম। রেলের এক পোর্টার দেখি চারিদিকে ব্লিচিংয়ের জল দিয়ে পানের পিকের দাগগুলো ধুচ্ছে।

মনে আছে, একজন মহিলা নেপালিদের মতো পোশাকে, মাথায় বড় রুমাল বাঁধা, চেয়ারে বসে আছে। সঙ্গে আরও অনেকে। চোখে কালো চশমা। একটা তেপায়ার মাথায় বড় একটা যন্ত্র বসানো, সেটাকে ঘিরে তিনজন দাঁড়িয়ে। যন্ত্রটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। এরই মাঝে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। ছুটলাম স্কুলের ভিতর। দেখি প্রার্থনা শুরু হয়েছে। চুপিসারে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়লাম লাইনে। প্রার্থনা শেষে সবাই দেখি হুড়মুড় করে ছুটছে পাঁচিলের দিকে। গৌতম স্যার আর পোদ্দার স্যারের কী হাসি। আজ মনে হয় তাঁদেরও ইচ্ছে ছিল পাঁচিলে ওঠার। গৌতম স্যার একবার হেঁকে দিয়ে গেলেন– কেউ চিৎকার করবে না। যা দেখবে চুপচাপ। আমি যথারীতি আবার সেই হাসপাতালের ভিতরে। কী সাংঘাতিক ভিড়। হঠাৎ দেখি ভিড়টা ঘুরে গেল। একটা সাদা রংয়ের গাড়ি, জানালায় পর্দা লাগানো। দরজা খুলে নামল একজন মানুষ। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। কালো প্যান্ট, কালো কোট, সাদা জামা, পায়ের জুতো চকচক করছে। হাসপাতালের যে লম্বা বারান্দা সেটা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে বলে উঠল, পানের পিক কে ফেলেছে এখানে। জমাদার––– কে যেন বলে উঠল 'কাট'।

আমরা সবাই চুপ। পরে শুনলাম ওটা নাকি শ্যুটিং হচ্ছিল। সেদিন আর স্কুল নেই। সবাই, এমন কি আমাদের মাস্টারমশাইরাও আমাদের সঙ্গে। তখনকার মানুষ এমন ছিল না যে পুলিশের দরকার হবে। সবাই দেখছি। কারও মুখে কোনও আওয়াজ নেই।

এবার দেখি ঘরের ভিতর কিছু একটা হবে। সব জিনিস এদিক ওদিক সরানো চলছে। জানালায় সবুজ পর্দা। আমি দে ছুট স্কুলের ভিতরে। যে ভাবেই হোক পাঁচিলে উঠতে হবে। একটা ফাইভে পড়া দাদাকে বললাম, আমাকে তুলে দেবে গো–

সে আমাকে তুলে দিল। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, যদিও একটু দূরের থেকেই। সেই মানুষটা চেয়ারে বসে, সামনে সেই নেপালি মতো পোশাকে মহিলা।

– এ রোগ কবে থেকে হল?

– কুছদিন পহেলে সাব।

– তোর স্বামী?

– নেহি সাব।

– ও তোর স্বামী থাকতে–

– সাব আপকে পাস কোঈ রোজ ভিখ মাঙ্গে তো আপ কেয়া রোজহি লোটা দেঙ্গে।

আবার 'কাট' বলে আওয়াজ–

পরের দিন গৌতম স্যারের মুখে শুনেছিলাম সেই মানুষটা নাকি বাংলা সিনেমার কিংবদন্তি নায়ক উত্তমকুমার। বাড়ি এসে মাকে বলেছিলাম, মা আমি উত্তমকুমারকে দেখেছি। বড় হয়ে যখন বনফুলের লেখা গল্প 'অগ্নি' পড়ি আর ছবিটাও দেখি তখন মনে একটা শিহরন ছেয়ে গিয়েছিল। আমার দেখা প্রথম কিংবদন্তি সেই মানুষ, উত্তমকুমার। যাঁকে আমি এই সিনেমাটায় অভিনয় করতে দেখেছি।

কবিতা

এসেছে নতুন তবু সবই যেন ভীষণ পুরোনো

নামগোত্রহীন
গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি যেদিন সব কথা মন খুলে বলতে পারবে সেদিন বুঝবে
ভেতরে ভেতরে কতটা হালকা লাগছে
শীতের বাতাসে যেমন পাতা ঝরে যায়
ঠিক তেমনই
তুমি কি একবারও কখন ভেবেছ কতটা
সচ্ছল তুমি ছিলে
তুমি বুঝতেই পারোনি নামগোত্রহীন হয়ে বেঁচে থাকার সঙ্গে
অমর্যাদা জড়িয়ে থাকে
সহানুভূতি আর কত রকমের মাত্রাহীন কথাবার্তা
যে সবের কোনও উত্তর জানা নেই
যে কোনও উৎকণ্ঠারও একটা বিরতি থাকে
কখন কীভাবে তোমার সবকিছু
নিলাম হয়ে যাবে
যখন মনে হবে
যারা এসে সমাধানের সূত্র বলতে চেয়েছিল
বিশ্বাস করে তাদের সব কথা বলা
ভুল হয়েছিল

একটি শাক্ত প্রস্তাব
অংশুমান কর

সেই একই বিচ্ছু হাওয়া
সেই একই বুড়ো বুড়ো রোদ
সেই একই কচি ডাব
সেই একই লাল শালু, খাতা
সেই একই এসএমএস
সেই একই চেনা চেনা ফোন
সেই একই মিছিলে পা
সেই একই 'ছাড়ব না হাল'
এসেছে নতুন তবু
সবই যেন ভীষণ পুরোনো

শোনো কন্যা, তুমি পারো
মুহূর্তে রঙিন করতে
যা কিছুই লাগে কালো–ধলো
যদি দ্বিধা ঝেরে ফেলে
এবার সমুদ্রে গিয়ে
বালিতে আল্পনা এঁকে
'যে কথা বলনি আগে
এ বছর সেই কথা বল।'

মৃত্যুর কাছাকাছি
দুর্গাদাস মিদ্যা

আহা মৃত্যুর মতো কিছু সত্য কথা তুলে রাখি
সযতনে। বুড়বুড়ি কাটে জল
তা সে হোক না যতই নিষ্ফল
তবু বলি থেকে যাও আরও কিছুক্ষণ।
যাবতীয় দুঃখ, সুখ সে তো নিত্যদিন থাকে
তা বলে এত অভিমান। এখন এই বিপন্ন সময়।
যদি দূরে যাও তবে বলো
কী নিয়ে আর বাঁচি।
তাই অসহায় আমি –
তোমাকে পেতে চাই কাছাকাছি।

উত্তরকন্যা
পিনাকী ঠাকুর

তোর্সা যখন ডাক দিয়ে যায় তিস্তাদের
উথাল পাতাল স্রোতের জলে বানভাসি

রিলিফ আসবে চিঁড়ের প্যাকেট! রাতজাগা
গ্রাম–নগরের মানুষ কুকুর গাছ পাখি...

যখন শহর গ্রাম বন্দর ঘুমন্ত
তিস্তা তোর্সা মহানন্দার ঘুম ভাঙে

জলের নীচে স্কুলবাড়ি আর রেল লাইন
(ক্রিকেট খেলায় ব্যস্ত তখন কলকাতা!)

পায়ের সামনে অন্তবিহীন সমুদ্র
মড়ক লাগল পাহাড়তলির বস্তিতে

তবুও আমরা বাঁচার জন্য হাত ধরি
প্রান্ত যেমন চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রকে!

আত্মজীবন
পাপড়ি ভট্টাচার্য

দিয়ে যেতে চাই, নিপুণ ভাবে
শালপাতায় মুড়ে আমার আত্মজীবন
প্রকৃতির গাঢ় সবুজ ধারাবাহিকে স্নাতক পৃথিবীকে।

আত্মহত্যা মহাপাপ –
অথচ অনেক আত্মজীবন সাদা কালোয়
পাতায় পাতায় হন্যমান –

জীবনে যুদ্ধ পাতার চেয়ে ঢের বেশি অশুদ্ধতা
গর্হিত কাজ মননে পচন বয়ে আনে
মৃত্যুর কথা নয় লিখব আত্মকথা
সেখানে লক্ষ লক্ষ জোনাকি আলোবিন্দু দুলিয়ে
সাজিয়ে দেবে গদ্যের প্রবহমানতা।

দেখা যাক প্রাণের চেতনাস্পর্শে
প্রজন্ম শিকড় সঞ্চারিত হয় কিনা।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক